

উচ্চ মূল্যস্ফীতি ও দারিদ্র পরিস্থিতির অবনতি

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, গত সেপ্টেম্বরে দেশের সার্বিক মূল্যস্ফীতির হার আগের মাসের চেয়ে দশমিক ৮ শতাংশ বেড়ে ৮ দশমিক ৩৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। আগের মাসে মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৮ দশমিক ২৬ শতাংশ। গত ২১ সেপ্টেম্বর সরকার সব ধরনের জ্বালানি তেলের মূল্য লিটারপ্রতি ২০ টাকা বাড়ানোর পর মূল্যস্ফীতি কিছুটা বেড়েছে। উদ্বেগের বিষয় হচ্ছে, উচ্চ মূল্যস্ফীতির সঙ্গে পাশ্চাত্য দিয়ে মানুষের গড় জাতীয় মজুরি বা আয় বৃদ্ধি না পেয়ে বরং কমেছে। গত সেপ্টেম্বরে গড় জাতীয় মজুরির হার ছিল ৭ দশমিক ৯০ শতাংশ। আগের মাসে এটা ছিল ৮ দশমিক ৫ শতাংশ।

বিগত চার বছরেরও বেশি সময় ধরে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রাকে বিপর্যস্ত করে তুলছে। করোনা-উত্তর বিশ্ব অর্থনীতি যখন উত্তরণের পর্যায়ে ছিল, তখন রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধ শুরু হয়। এ যুদ্ধের কারণে বিশ্বব্যাপী সাপ্লাই চেইন ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়। দেশে দেশে খাদ্যভাব দেখা দেয়। অথচ সেই সময় বিশ্বব্যাপী খাদ্য উৎপাদন ছিল স্বাভাবিক। কিন্তু পরিবহন জটিলতার কারণে খাদ্যসহ সব ধরনের নিত্যপণ্যের দাম অস্বাভাবিকভাবে বেড়ে যায়। সেই সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনীতিতে মূল্যস্ফীতির হার বেড়ে ৯ দশমিক ১ শতাংশে উন্নীত হয়, যা ছিল দেশটির ৪০ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ মূল্যস্ফীতি। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকা উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের পাশাপাশি একাধিকবার পলিসি রেট বৃদ্ধি করে। এসব ব্যবস্থা দেশটির মূল্যস্ফীতিকে ধীরে ধীরে সহনীয় পর্যায়ে নামিয়ে আনতে সহায়তা করে। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকার

দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বাংলাদেশসহ অন্তত ৭৭টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক তাদের পলিসি রেট বৃদ্ধি করে। আগে বাংলাদেশ ব্যাংকের পলিসি রেট ছিল ৫ শতাংশ। একপর্যায়ে তা বেড়ে ১০ শতাংশে উন্নীত হয়। পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক অবশ্য দশমিক ৫০ শতাংশ কমিয়ে পলিসি রেট ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ নির্ধারণ করে। সর্বশেষ মুদ্রানীতিতেও পলিসি রেট ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ বহাল রাখা হয়েছে।

উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংকের একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হচ্ছে পলিসি রেট বাড়ানো। শিডিউল ব্যাংকগুলো কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে স্বল্পকালীন ঋণ গ্রহণের সময় যে সুদ প্রদান করে, সেটাই পলিসি রেট বা রেপো রেট। পলিসি রেট বাড়লে শিডিউল ব্যাংকগুলোকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণের সময় অতিরিক্ত সুদ দিতে হয়। ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক অব আমেরিকার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে যেসব দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক পলিসি রেট বৃদ্ধি করে, তাদের অধিকাংশই অভ্যন্তরীণ অর্থনীতিতে বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বিস্ময়কর সাফল্য প্রদর্শন করেছে অর্থনৈতিকভাবে সমস্যাগ্রস্ত দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলংকা। কয়েক বছর আগে শ্রীলংকা আন্তর্জাতিকভাবে ঋণখেলাপি দেশে পরিণত হয়। দেশটির মূল্যস্ফীতির হার ২০২২ সালের সেপ্টেম্বরে ৬৭ দশমিক ৪০ শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। সেখান থেকে তারা পলিসি রেট বৃদ্ধিসহ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছে। গত সেপ্টেম্বরে শ্রীলংকার মূল্যস্ফীতির হার ছিল ৪ শতাংশ।

বাংলাদেশ ব্যাংক একাধিকবার পলিসি রেট বৃদ্ধি করে ৫ থেকে ১০ শতাংশে উন্নীত করলেও (বর্তমানে ৯ দশমিক ৫০ শতাংশ) মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে কোনো সাফল্য দেখাতে পারেনি। অনেকেই মনে করেন, পলিসি রেট বৃদ্ধি করলেও উল্লেখিত সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংক এমন কিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করে, যা উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সমস্যা সৃষ্টি করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক পর্যায়ক্রমে পলিসি রেট বৃদ্ধি করে ১০ শতাংশে উন্নীত করলেও ব্যাংক ঋণের সর্বোচ্চ সুদের হার অনেক দিন পর্যন্ত ৯ শতাংশে ফিক্সড করে রাখে। সেই সময় কোনো কোনো ব্যাংকের 'কস্ট অব ফান্ড' ছিল সোয়া ৮ শতাংশ। সোয়া ৮ শতাংশ ব্যয়ে ফান্ড তৈরি করে তা ৯ শতাংশে বিনিয়োগ করা মোটেও লাভজনক ছিল না। ফলে শিডিউল ব্যাংকগুলো ঋণ সংকোচন নীতি গ্রহণ করে। তারা সাধারণ গ্রাহক ও উদ্যোক্তাদের আর আগের মতো অবারিত ঋণদানে আগ্রহী হয় না। এতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি কমে যাওয়ার কথা থাকলেও কার্যত তা হয়নি।

ফ্যাসিস্ট সরকারের সমর্থনপুষ্ট ব্যবসায়ী-উদ্যোক্তাগোষ্ঠী ব্যাংক ম্যানেজমেন্টের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ঋণের নামে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যাংক থেকে বের করে নেয়। ফলে পলিসি রেট বৃদ্ধির মাধ্যমে বাজারে অর্থ সরবরাহ কমানোর প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ২০২২ সালের মুদ্রানীতিতে ব্যক্তি খাতে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছিল ১৪ দশমিক ১ শতাংশ। বাস্তবে ব্যাংক ঋণের প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছিল ১৪ দশমিক ৭ শতাংশ। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, সেই সময় কাঁচামাল ও মধ্যবর্তী পণ্য আমদানি কমেছিল ১৪ শতাংশ করে। শিল্পে ব্যবহার্য ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আমদানিও ব্যাপকভাবে কমেছিল। তাহলে প্রশ্ন দেখা দেয়, লক্ষ্যমাত্রার চেয়ে ব্যাংকগুলো যে বেশি ঋণ প্রদান করল, তা কোথায় গেল? অর্থনীতিবিদদের অনেকেই অভিযোগ করেন, ব্যাংক থেকে শিল্প-কারখানা স্থাপনের নামে ঋণ নিয়ে তা অনুৎপাদনশীল খাতে ব্যবহার করা হয়। এ অর্থ কোনো না কোনোভাবে বাজারে চলে এসেছে। ফলে বিদ্যমান উচ্চ মূল্যস্ফীতি সহনীয় পর্যায়ে কমে আসেনি। অনেকে ব্যাংক থেকে ঋণ গ্রহণ করে তা বিদেশে পাচার করেছেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

১ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অ্যাসোসিয়েশন অব ব্যাংকার্স বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশ ফরেন এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন যৌথভাবে নির্ধারিত মূল্যে ব্যাংক থেকে ১১০ টাকায় নির্ধারণ করে। ফলে বাজারে ডলারের ক্রাইসিস দেখা দেয়। সাধারণ গ্রাহকরা নির্ধারিত মূল্যে ব্যাংক থেকে চাহিদাকৃত ডলার সংগ্রহ করতে পারছিলেন না। ফলে কার্ব মার্কেট প্রতি ডলারের মূল্য ১২৩-১২৪ টাকায় উন্নীত হয়। সরকারসমর্থক ব্যবসায়ীগোষ্ঠী নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে ব্যাংক থেকে তাদের চাহিদাকৃত ডলার ঠিকই বের করে নিয়েছেন। প্রতি ডলারের বিনিময় হার ১১০ টাকায় ফিক্সড করে রাখার ফলে প্রবাসী আয়ে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে। প্রবাসী বাংলাদেশিরা কার্ব মার্কেটে ডলারের বিনিময়ে বেশি পরিমাণ স্থানীয় মুদ্রা পাওয়ার প্রত্যাশায় ব্যাংকিং চ্যানেলের পরিবর্তে হুন্ডির মাধ্যমে রেমিট্যান্স দেশে পাঠাতে থাকেন। ফলে বৈধ চ্যানেলে রেমিট্যান্স আসা কমে যায়।

বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতীয়মান হয়েছে, বাংলাদেশের মতো অর্থনীতিতে শুধু সংকোচনমূলক মুদ্রানীতি বাস্তবায়নের মাধ্যমে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য রাজস্ব পলিসিকে টেলে সাজাতে হবে। একইসঙ্গে সাপ্লাই চেইন ঠিক করতে হবে। বাজারে তৎপর ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে।

দেশের অর্থনীতিতে বর্তমানে যেসব সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে, তার মধ্যে উচ্চ মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা অন্যতম। উচ্চ মূল্যস্ফীতি দেশের দারিদ্র্য পরিস্থিতিকে জটিল থেকে জটিলতর করে তুলছে। সম্প্রতি প্রকাশিত বিশ্বব্যাংকের 'বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট আপডেট' প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০২৬ সালে বাংলাদেশে নতুন করে ২২ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেছে। এ নিয়ে গত চার বছরের মোট ৮০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে চলে গেল। উচ্চ মূল্যস্ফীতিজনিত কারণে মানুষের প্রকৃত আয় কমে

যাওয়ায় দারিদ্র্য পরিস্থিতির অবনতি ঘটেছে। বর্তমানে দারিদ্র্যসীমার সামান্য উপরে অবস্থান করছে ৬ কোটি ২০ লাখ মানুষ। সামান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের মতো অভিঘাতে এরা দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে যেতে পারে। আন্তর্জাতিকভাবে অনুসৃত সংজ্ঞা অনুযায়ী, একজন মানুষের দৈনিক গড়ে ২ হাজার ১২২ ক্যালরি খাদ্যসংক্রান্ত খাবার ও অন্যান্য পণ্য ক্রয় করতে যে অর্থের প্রয়োজন, তা আয় করতে না পারলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে দারিদ্র্যসীমার নিচে বলে মনে করা হয়। এ বছর মোট ৩০ লাখ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেছে। একবার দারিদ্র্যসীমার নিচে নেমে গেলে তার পক্ষে পুনরায় দারিদ্র্যসীমার উপরে উঠে আসা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

জ্বালানি সংকটসহ নানা প্রতিকূলতার কারণে কল-কারখানায় উৎপাদন কমে যাওয়ায় দেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সংকুচিত হয়ে পড়েছে। বিশ্বব্যাংকের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, শিল্প ও সেবা খাতে কর্মসংস্থানের হার কমেছে। পাশাপাশি কৃষিতে কর্মসংস্থানের হার বেড়েছে। কিন্তু কৃষিতে যে কর্মসংস্থান হয়, তাকে এখনো আনুষ্ঠানিক কর্মসংস্থান হিসেবে বিবেচনা করা হয় না; আর কৃষিতে যারা কর্মসংস্থান করেন, তাদের মজুরির হার শিল্প ও সেবা খাতের তুলনায় অনেক কম। বিশ্বব্যাংকের প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, ২০২৬ সালে ৯ লাখ মানুষের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে প্রতি দশটির মধ্যে ৭টি কর্মসংস্থান হয়েছে কৃষি খাতে। একই বছর মোট ২০ লাখ মানুষ শ্রমবাজারে প্রবেশ করেছে। এদের সবার জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়নি।

কর্মসংস্থান হচ্ছে দারিদ্র্যবিমোচনের প্রধান হাতিয়ার। কর্মসংস্থান ছাড়া দারিদ্র্যবিমোচন সম্ভব নয়। দেশে কারিগরি শিক্ষার প্রসার না থাকায় কর্মসংস্থান বলতে প্রধানত সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি করাকেই বোঝায়। কিন্তু সরকারি এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন

প্রতিষ্ঠানে চাকরির সুযোগ অত্যন্ত সীমিত। তাই শুধু প্রাতিষ্ঠানিক চাকরির মাধ্যমে বেকার সমস্যার সমাধান করা কোনোভাবেই সম্ভব নয়। বেকার সমস্যার সমাধান করতে হলে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে প্রত্যেক মানুষের হাতকে 'কর্মীর হাতিয়ারে' পরিণত করতে হবে। উন্নত দেশগুলোতে কারিগরি শিক্ষার হার ৫০ থেকে ৭০ শতাংশ। আর বাংলাদেশে কারিগরি শিক্ষার হার ৮ থেকে ১০ শতাংশ মাত্র। কারিগরি শিক্ষার হার অন্তত ৪০ শতাংশে উন্নীত করা না গেলে উন্নয়নের কাজক্ষিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হবে না। কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত একজন মানুষ যদি আত্মকর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে, তাহলে উচ্চ মূল্যস্ফীতি তার জন্য কোনো সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে না। দেশের সমাজব্যবস্থার বিদ্যমান বাস্তবতায় দারিদ্র্যবিমোচনের জন্য স্বল্পমেয়াদি ও দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা জরুরি বলে মনে করি।

লেখকঃ ড. আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরী, প্রফেসর ইমেরিটাস; সাবেক উপাচার্য, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়; বাহরাইনে নিযুক্ত বাংলাদেশের সাবেক রাষ্ট্রদূত।